পা ঠ প্র তি ক্রি য়া

রোজেনবার্গের ‘আর্ট ফর অ্যাকশন’-এ রাজা রবি বর্মা

মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ

[থার্ড লেন স্পেস হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে সংকলিত]

মিনহাজ ভাই, রবি বর্মা ও ভারতীয় চিত্রকলা নিয়ে আপনি যে-আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, সেটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আপনার ভেতরে যে-দ্বিধা ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে—একদিকে জনতার শিল্পরুচি, অন্যদিকে রুচিবান-অভিজাতের নিয়ন্ত্রণ—এই দুইয়ের টানাপোড়েনের ভেতরে দাঁড়িয়ে রোজেনবার্গের ‘অ্যাকশন’ ধারণাকে বুঝতে চাওয়ার প্রয়াস তাৎপর্যপূর্ণ।

রবি বর্মা নিঃসন্দেহে ভারতীয় চিত্রকলার কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিশেষ করে দেব-দেবীদের মানবিক রূপে তুলে ধরা এবং লিথোগ্রাফিক প্রিন্টের মাধ্যমে তাঁর ছবিকে সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার যে-উদ্যোগ, তা সময়ের বিচারে বৈপ্লবিক ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, রাজদরবারি রুচি এবং উদীয়মান জাতীয় চেতনার সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি ইউরোপীয় বাস্তবধর্মী ও প্রকৃতিনিষ্ঠ কৌশলকে ভারতীয় পুরাণ ও আখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে এমন এক চিত্রভাষা তৈরি করেন, যা একদিকে অভিজাত পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা পায়, অন্যদিকে ধীরে ধীরে জনপরিসরেও ছড়িয়ে পড়ে।

রাজা রবি বর্মা প্রচলিত অর্থে ইউরোপীয় একাডেমির ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু ইউরোপীয় কৌশলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল গভীর। তেলরঙ, আলো-ছায়া, দেহের ভঙ্গিমা, কাপড়ের ভাঁজ, মুখাবয়বের স্বাভাবিকতা—এসবই তিনি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করেছিলেন। হিন্দু পুরাণের বিষয়বস্তুকে ইউরোপীয় *realist* ও *naturalist* শৈলীর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন রবি বর্মা। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এটাই তাঁকে পথপ্রদর্শক করে তুলেছিল। তিনি ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের একজন, যিনি তেলরংয়ে দক্ষতা অর্জন করেন এবং সেটিকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। ফলে রবি বর্মা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, তবে তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য খুব বেশি সোর্স পাওয়া যায় না; যে-কারণে বেশিরভাগকেই রণজিৎ দেশাই লিখিত উপন্যাস রাজা রবি বর্মার উপর নির্ভর করতে হয়, যেটি থেকে বিখ্যাত চলচ্চিত্র রং রসিয়া বানানো হয়েছিল—যেটার উল্লেখ আপনার লেখায় পাওয়া যায়।

এখন, আপনি যে-প্রশ্নটি তুলেছেন—এই দুই সংকটের ভেতরে দাঁড়িয়ে শিল্পী কীভাবে ‘অ্যাকশন’-এর পথে এগোবে;—এই জায়গাতেই আমার মনে হয় এখনও কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝি রয়ে গেছে। এখানে ‘অ্যাকশন’ ধারণাটিকে যেন একটি স্থির মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। অথচ রোজেনবার্গের কাছে ‘অ্যাকশন’ কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা বিচারপদ্ধতি ছিল না। একে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করাটাই যথার্থ হবে।

রোজেনবার্গ নিজেই জানতেন, শিল্পকে চূড়ান্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা মানে তাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা। আবার যে-মানুষটি সারাজীবন স্থির কাঠামোর বিরোধিতা করেছেন, তাঁর ভাবনাকে সেই কাঠামোর মধ্যে বন্দি করা মানে তাঁর চিন্তার প্রতি কিছুটা হলেও অবিচার করা।

ডেবরা বালকেন বারবার দেখিয়েছেন, রোজেনবার্গ তাঁর পরবর্তী লেখাগুলোয় নিজের আগের অবস্থানকেও প্রশ্ন করছেন, শিথিল করছেন, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে প্রায় উল্টেও দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 'অ্যাকশন'কে নৈতিক বিধান ভাবার পক্ষপাত ছিল না, শিল্পীর শিল্পসত্তাকে অবিরত যাচাই করার প্রক্রিয়া হিসেবেই একে দেখেছেন।

বালকেন এই বিষয়ে রোজেনবার্গ ও গ্রিনবার্গের তুলনামূলক আলোচনায় চমৎকার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি দেখান, গ্রিনবার্গের ফরমালিস্ট সমালোচনার ধারা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থাকায় সহজে বোধগম্য ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁর অনুসারীও বেশি ছিল। অন্যদিকে, রোজেনবার্গের 'অ্যাকশন' ধারণার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। পরবর্তী সময়ে যৌক্তিক কারণে অনেকেই তাঁর তত্ত্ব তাই গ্রহণ করতে পারেননি।

বালকেনের দৃষ্টিভঙ্গি ধার করে বিষয়টিকে আরেকটু বিস্তারিত করা যায়। রোজেনবার্গ শিল্পকে কোনো স্থির বস্তু হিসেবে দেখেননি; তাঁর কাছে ক্যানভাস ছিল একটি 'ঘটে ওঠার পরিসর', যেখানে শিল্পী নিজের অস্তিত্ব, সংকট, অভিজ্ঞতার সবকিছুই 'ক্রিয়ার' ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে। অর্থাৎ শিল্প মানে শুধু কী আঁকা হলো তা নয়, বরং কীভাবে কাজটি ঘটল—সেটি এখানে বিবেচ্য। এই ভাবনায় ফর্ম, রং, কম্পোজিশন গৌণ হয়ে যায়; কেন্দ্রে আসে শিল্পীর অবস্থান;—তার সময়, তার ভেতরের টানাপোড়েন ও সামাজিক বাস্তবতা।

অন্যদিকে, গ্রিনবার্গ শিল্পকে বোঝেন তার দৃশ্যমান গঠন ও ফর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাঁর কাছে শিল্পের ইতিহাস একটি ধারাবাহিক অগ্রগতি, যেখানে মাধ্যমের বিশুদ্ধতা ও গঠনগত সূক্ষ্মতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট, কাঠামোবদ্ধ এবং সহজে শেখানো যায়। ফলে এটি দ্রুত একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়, এবং বাজারে সহজে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ, রোজেনবার্গ শিল্পকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখছেন, পক্ষান্তরে গ্রিনবার্গ একে বিশ্লেষণযোগ্য রূপ হিসেবে ধরতে চাইছেন।

The American Action Painters প্রবন্ধে রোজেনবার্গ শিল্পকে একধরনের ক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি কোনো নির্দিষ্ট শিল্পীর নাম উল্লেখ না করায় অনেকে নিজেকে এই ধারণার অংশ বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। প্রবন্ধটি ব্যাপক আলোড়ন তোলে, কিন্তু একই সঙ্গে এটি কোনো স্পষ্ট রূপরেখা দেয়নি; বরং একটি আবহ ও ধারণা দাঁড় করিয়েছিল। এর ফলে, অনুপ্রেরণামূলক হলেও শিল্পীরা একে ক্যানভাসে কম ব্যবহার করেছেন। এর সীমাবদ্ধতা হয়তো এখানে পাচ্ছি আমরা।

উক্ত সীমাবদ্ধতার বিপরীতে গ্রিনবার্গের শক্তি নিহিত ছিল তাঁর পদ্ধতিগত স্বচ্ছতায়। তাঁর ধারণা সহজে পাঠ্যক্রমে ঢুকে পড়ে, নতুন প্রজন্মের সমালোচকরা তা সাদরে গ্রহণ করেন, এবং 'ফর্মালিজম' ধীরে ধীরে একাডেমিক ভাষায় পরিণত হয়। ১৯৬০-এর দশকে *Artforum* কেন্দ্রিক যে- সমালোচনাচর্চা গড়ে ওঠে, তা এই ধারাকে আরও প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। রোজেনবার্গ সেখানে জায়গা পাননি, কারণ তাঁর ভাবনা এই কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না।

তবে, রোজেনবার্গের গুরুত্ব এখানে-যে, তিনি এই পুরো প্রক্রিয়াকে আগেভাগে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, শিল্প ক্রমে বাজারের অংশ হয়ে যাচ্ছে, জাদুঘর ও একাডেমির ভেতরে নির্দিষ্ট মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে, এবং শিল্পীর স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়ছে ক্রমাগত। *art establishment*-এর কথা তিনি বলেছেন :—একটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠী, যেখানে শিল্প, সমালোচনা, বাজার ও প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করে। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ায় শিল্পীর অস্তিত্বগত সংকট, যা একসময় শিল্পকে তীব্র ও জীবন্ত করে তুলেছিল... তা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

বালকেন রোজেনবার্গের এই দূরদর্শিতার দিকটি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। ১৯৪০-এর দশক থেকেই তিনি ইতিহাসকে খণ্ডিত ও ভগ্ন ভাবতে শুরু করেন, অ্যাভান্ট-গার্ডের স্বকীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, এবং কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রভাব নিয়েও তাঁকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। রোজেনবার্গ এমনকি দেখিয়েছিলেন,—ফর্মালিজম কখনো কখনো সামাজিক বাস্তবতা, যেমন বর্ণগত বৈষম্য আড়াল করার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এই দিকগুলো পরবর্তী উত্তর-আধুনিক চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে। তবুও তাঁর একটি বড় সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়, আর তা হলো,—শিল্প বিশ্লেষণের কোনো সুস্পষ্ট পদ্ধতি তিনি দিয়ে যাননি। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে অনুসরণ করার কথা ভাবেনি, যেখানে গ্রিনবার্গের অনুসারীগণ অন্তত একটি নির্দিষ্ট বিশ্লেষণধারা গড়ে তুলতে পেরেছেন।

ফিলিপ গাস্টনের উদাহরণ এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গাস্টন যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বিমূর্ততা থেকে ফিগারেটিভ চিত্রকলায় ফিরে আসেন, রোজেনবার্গ এটিকে '*detachment* থেকে মুক্তি' হিসেবে দেখেন। শিল্প এখানে পুনরায় বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়। শিল্পীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা একসূত্রে মিলিতও হয়। এই ব্যাখ্যা দেখায় রোজেনবার্গের কাছে শিল্প কখনোই কেবল রূপের খেলা নয়, বরং জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত প্রক্রিয়া ছিল।

গ্রিনবার্গের পদ্ধতি এখনও প্রভাবশালী, কারণ তা সহজে ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু রোজেনবার্গের মতো যে-সমালোচক শিল্পকে তাঁর সময়ের সংকট, অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করেন,—সেই কণ্ঠ আজ কতটা উপস্থিত? বালকেন ঘুরেফিরে এই প্রশ্ন তোলেন ও দেখান,—রোজেনবার্গের চিন্তায় এমন কিছু দিক রয়েছে, যা ভবিষ্যতে তাঁকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে।

আবার, রোজেনবার্গ ফোক আর্ট নিয়ে কী ভাবতেন, সেটি তাঁর মৌখিক সাক্ষাৎকার সিরিজে পাওয়া যায়। সেখানে রোজেনবার্গকে আমরা বলতে শুনি :

> ***MR. ROSENBERG:***
> *We discovered, for example, in Missouri there was this terrific merry-go-round factory—or in Kansas, I think it was—a terrific merry-go-round factory, where they hired wood carvers from Italy and had them making these beautiful horses and other objects for sale all over the east and even in Europe. Things like that. We'd just have guys that'd dig up all this stuff. And my insistence in those days—and I think I was right, although I was probably influenced by Marxism in doing this—was to pay a lot of attention to the folk art.*
>
> ***MR. CUMMINGS:***
> *Yeah.*
>
> ***MR. ROSENBERG:***
> *To folk art, commercial art, and not to restrict it to the idea of how good these guys were in relation to contemporaries in Europe, because if you took that view there wasn't anybody there, you see.*

রোজেনবার্গ আসলে ফোক আর্টের কথা বলতে গিয়ে যেন একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেই অবস্থান নিচ্ছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি হলো,—শিল্পকে বোঝার একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ইউরোপীয়

ধারাকে ধরে নেওয়া; যেখানে রেনেসাঁ থেকে আধুনিকতা পর্যন্ত একটানা একটি 'উচ্চ' ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, এবং অন্য সবকিছুকে তার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা হয়।

হ্যারল্ড রোজেনবার্গ এই জায়গাটায় এসে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, যদি আমরা আমেরিকার শিল্পকে ইউরোপীয় মানদণ্ডে বিচার করি, তাহলে আমরা প্রায় অবধারিতভাবেই বলব—'এখানে তো তেমন কিছু নেই।' কারণ আমেরিকায় সেই দীর্ঘ একাডেমিক ঐতিহ্য, সেই ধারাবাহিক রেনেসাঁ—কিংবা চিত্রকলার আন্দোলনের বিকাশ—অনুপস্থিত।

এই অবস্থার বিপরীতে আমেরিকার ফোক আর্টকে তিনি সামনে আনতে চেয়েছেন, যেখানে আছে সাধারণ মানুষের তৈরি নানা জিনিসপত্র;—লোকশিল্প, হস্তশিল্প, দোকানের সাইনবোর্ড, কাঠের খেলনা, গৃহস্থালির বস্তু, কাপড়ের নকশা, এমনকি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রও। এগুলোকে আমরা সাধারণত 'শিল্প' রূপে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহ বোধ করি না, যেহেতু এসব সামগ্রী কোনো গ্যালারির জন্য তৈরি হয়নি অথবা প্রতিষ্ঠিত শিল্পতাত্ত্বিক তত্ত্বের অধীনেও তারা পড়ছে না।

রোজেনবার্গের কাছে এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তারা সাংস্কৃতিক ভাষার ভিন্ন একটি প্যাটার্ন জন্ম দিচ্ছে। এর ভেতরে একটি সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তার শ্রম, তার কল্পনা, তার বেঁচে থাকার রীতিনীতির সবটাই জমাট বেঁধে আছে। তার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জ্ঞান বা বোঝার কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন ভাবা যেতে পারে।

তাঁর মতে, 'শিল্প কী'?—এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখি। তারপর সেই উত্তরের ওপর ভর করে অন্য সংস্কৃতিকে বিচার করে ফেলি। এর ফলে যেটি হয়—আমেরিকার মতো সমাজ, যেখানে শিল্পের বিকাশ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন ও বহুমাত্রিক থাকছে, তা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। রোজেনবার্গ তাই এক ধরনের 'counter-history' নির্মাণ করতে চান;—একটি বিকল্প শিল্প ইতিহাস, যেখানে গ্যালারি বা মিউজিয়ামের শিল্প নয়, বরং মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা শিল্পকর্ম গুরুত্ব পাবে। এভাবে শিল্পকে দেখলে *high art* ও *low art*-এর বিভাজকরেখা ভেঙে পড়ে।

রোজেনবার্গের এই অবস্থান আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে আনে—শিল্পের মূল্য কেবল তার গুণমান বা দক্ষতায় নয়, বরং তার প্রেক্ষাপটেও নিহিত থাকে। অর্থাৎ, একটি জিনিস কতটা ভালো আঁকা হয়েছে, সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তা কোথা থেকে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল ও কোন মানবসমাজের জীবনধারার অংশ রূপে আমাদের সামনে এখন হাজির হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে আমেরিকার শিল্প হঠাৎ করে নতুনভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তখন আমরা দেখতে পাই শিল্প কেবল নিউ ইয়র্কের স্টুডিওতে নয়, বরং গ্রামাঞ্চলের কাঠের ঘরে, বাজারের সাইনবোর্ডে, মেলার খেলনায় ছড়িয়ে আছে।

এখানে একটি গভীর রাজনৈতিক মাত্রাও আছে। কারণ ইউরোপীয় মানদণ্ডকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা মানে একধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্য মেনে নেওয়া। রোজেনবার্গ এই আধিপত্যটি ভাঙতে চান;—তিনি বলতে চান, প্রতিটি সমাজের নিজস্ব শিল্প-ভাষা আছে, এবং সেটিকে তার নিজস্ব প্রেক্ষাপটে বোঝা প্রয়োজন। এই চিন্তা পরবর্তীকালে উপনিবেশ-উত্তর (পোস্টকলোনিয়াল) বা উপনিবেশমুক্ত (ডিকলোনিয়াল) তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ; যেখানে বলা হয়, জ্ঞান ও নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্র একক নয়, বরং বহুবিধ।

রোজেনবার্গ আমাদের শেখান—শিল্প কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা মানদণ্ডে বন্দি নয়;—মানুষের জীবনযাপনের ভেতরেই তার প্রকৃত উৎস নিহিত। আর সেই জীবনযাপনকে যদি আমরা ভুলভাবে দেখি, তাহলে শিল্পের পুরো ইতিহাসটি আমাদের কাছে বিকৃত হয়ে উঠবে।

রোজেনবার্গের লেখায় রাজা রবি বর্মার কোনো উল্লেখ পাইনি। সোর্স সীমিত থাকার কারণে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছু হাজির করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রবি বর্মাকে তিনি কীভাবে বিচার করতেন? প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে ভাবায়। তবে, রোজেনবার্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে রবি বর্মা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সেই প্রচেষ্টায় আমি আগানোর চেষ্টা করব।

রবি বর্মা পশ্চিমা কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সেটি অন্ধ আনুগত্য বা নিছক অনুকরণ ছিল না। তিনি দেবদেবী, মহাকাব্যিক চরিত্র, সংস্কৃত সাহিত্য, নৃত্যনাট্য, রাজপরিবার, অভিজাত নারী, মাতৃত্ব, প্রেম, বিরহ, প্রতীক্ষা… এসব ভারতীয় বিষয়কে নতুনভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দাময়ন্তী, শকুন্তলা, সীতা, যশোদার মতো চরিত্রকে কেবল ধর্মীয় প্রতীক রূপে ক্যানভাসে হাজির করেননি, তাঁদেরকে একটি মানবায়িত স্বরূপ দান করেছেন। এর ফলে দেবত্ব বিলীন হয়ে যায়নি, বরং আরও মানবিক হয়ে উঠেছে। অনেকের কাছে এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি;—রবি বর্মা যেখানে ভারতীয় পুরাণকে ‘দেখার’ এক নতুন ভাষা উপহার দিয়ে গেছেন।

তাঁর শিল্পজীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতার বাস্তবতা। তিনি নানা রাজপরিবার, দেশি রাজ্য ও অভিজাত গোষ্ঠীর জন্য *portrait* ও অর্ডারভিত্তিক কাজ করেছেন; এই অভিজাত আশ্রয় ছাড়া তাঁর বিশাল ক্যানভাস, তেলরঙের উপকরণ, ভ্রমণ, পরীক্ষানিরীক্ষা—সবকিছু চালানো কঠিন হতো। জীবনীমূলক উপন্যাসেও দেখা যায়, রাজদরবার, মহারাজা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর জীবন গভীরভাবে জড়িত। অর্থাৎ তাঁর শিল্পীজীবন ছিল স্পষ্টতই অভিজাত।

যদি একজন শিল্পীর প্রধান ক্রেতা, পৃষ্ঠপোষক, মডেল, সামাজিক বৃত্ত—সবই অভিজাত, তাহলে তাঁকে কি জনমানুষের শিল্পী বলা যায়? প্রশ্নটি যথার্থ। কারণ রবি বর্মার ছবিতে আমরা খুব কমই কৃষক, মজুর, নিম্নবর্গের দৈনন্দিন জীবন, ঔপনিবেশিক নিপীড়ন, দারিদ্র্য, শ্রম, সামাজিক ক্ষত গুরুত্ব পায়নি। তাঁর ক্যানভাসের প্রধান পৃথিবী হলো পুরাণ, মহাকাব্য, আভিজাত্য, শরীরী সৌন্দর্য, নান্দনিক আবেগ, রাজকীয় ভঙ্গি ও সংস্কারযুক্ত সামাজিক মর্যাদা। এদিক থেকে দেখলে তিনি ‘জনমানুষের জীবন’ ক্যানভাসে আঁকেননি। সমালোচনাটি এখানে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

এভাবে বিচার করাটাও তথাপি অস্বস্তিকর, কেননা রবি বর্মা এমন এক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যেখানে অভিজাত আশ্রয়ে তৈরি শিল্প প্রযুক্তির সাহায্যে অভিজাত পরিসর ভেঙে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৮৯৪ সালে তিনি ও তাঁর ভাই মিলে মুম্বাইয়ে রাজা রবি বর্মা প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন; পরে সেটি মালাভলি-লোনাভলাতেও কার্যক্রম চালায়। এই প্রেস ছিল ভারতে বৃহৎ মাপের ছাপা-প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলোর একটি, এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কাজকে বড় পরিসরে ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ।

শিল্প উপভোগের রীতি এর প্রভাবে বদলে যায়। ছবি আর শুধু রাজপ্রাসাদ বা ধনী সংগ্রাহকের দেওয়ালে থাকেনি। ছাপা *oleograph* হয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে। দেবদেবীর ছবি, পুরাণের দৃশ্য, আরাধ্য রূপের সবটাই ধীরে-ধীরে গৃহস্থালির ভিজ্যুয়াল সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। এই অর্থে তিনি ‘জনমানুষের জীবন’ না এঁকেও ‘জনমানুষের জন্য দৃশ্যমান জগৎ’ নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান তাই দুই স্তরিক। প্রথমত, তিনি ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্যকে আধুনিক দৃশ্যমান রূপ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি শিল্পের *circulation* বদলে দিয়েছেন। এই দ্বিতীয় অবদানটি প্রায়শ যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। অনেক শিল্পী বড় ক্যানভাস আঁকেন, খুব কম শিল্পী একটি জাতির দেখার অভ্যাস বদলাতে ভূমিকা রাখতে পারেন। আজ দক্ষিণ এশিয়ায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণ, যশোদা, শকুন্তলা, দাময়ন্তীর মতো চরিত্রকে আমরা যে-নির্দিষ্ট ভঙ্গি, বস্ত্র, শারীরিক উপস্থিতি, মুখাবয়ব ও আবেগে কল্পনা করি, তার পেছনে রবি বর্মার কাজের গভীর প্রভাব আছে।

তবে তাঁর শক্তির পাশাপাশি সমালোচনার জায়গাও স্পষ্ট। তাঁর নারীরা প্রায়ই মনোহর, স্থির, লজ্জাশীলা, সৌন্দর্যমণ্ডিত, অলঙ্কৃত; এদের মধ্যে অনেকসময় একধরনের উচ্চবর্ণ-অভিজাত নারীর শরীর-রুচি প্রধান হয়ে ওঠে। এ-কারণে পরবর্তী সমালোচকরা বলেছেন, তাঁর নারীচিত্র *stereotypical, exclusionary,* এমনকি কিছু ক্ষেত্রে *eroticized*। অর্থাৎ তিনি ভারতীয় নারীকে কেন্দ্রে আনলেও, তা সেখানে বহুবর্ণ বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, একে বরং একটি বিশেষ রুচির নির্মাণ ভাবা যেতে পারে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে রবি বর্মার চিত্রকর্মের বড় অংশই *representational*;—পুরাণ, চরিত্র, আবেগের সবকিছু যেখানে পূর্বনির্ধারিত। রোজেনবার্গীয় বিচারে অটল থাকলে রাজা রবি বর্মা *action painter* নন কোনোভাবে। তিনি একজন আখ্যাননির্মাতা (narrative painter);—যাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতিতে ক্যানভাস কোনো 'ঘটনা' হয়ে উঠছে না, তা কেবল 'দৃশ্য'-এ সীমাবদ্ধ থাকছে।

কিন্তু এভাবে দেখাটাও আংশিক, কারণ তাঁর আসল 'অ্যাকশন' ক্যানভাসে ছিল না;—circulation-এ নিহিত থেকেছে। ছবির সামাজিক বিস্তার ঘটানোর কারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বা তাঁকে অ্যাকশন আর্টিস্টের পরিধি থেকে ছাটাই করার সুযোগ কমে আসে। দেবতাকে অভিজাত চিত্রভাষা থেকে সরিয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। লিথোগ্রাফিক প্রিন্টের মাধ্যমে এমন এক দৃশ্যমান সংস্কৃতি তৈরি করেছিলেন, যা মানুষের দেখার অভ্যাসটাকে বদলে দিয়েছিল। রবি বর্মা জনমানুষের জীবন আঁকেননি, কিন্তু জনমানুষ কীভাবে দেবতাকে কল্পনা করবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে গেছেন।

এখানে একটি দ্বৈততা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে তিনি অভিজাত পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করেছেন; তাঁর ক্যানভাসে নিম্নবর্গ প্রায় অনুপস্থিত। অন্যদিকে তিনিই শিল্পকে গণছবিতে (মাস ইমেজ) রূপান্তরিত করেছেন। এটি কি শিল্পের গণতন্ত্রীকরণ, না কি সরলীকরণ? আমার মনে হয়—দুটোই। এখানেই তাঁর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা পাশাপাশি অবস্থান করে।

এখন রোজেনবার্গে ফিরে আসি। আপনি যে-কথা বললেন—এই উভয় সংকটাই মনে হয় শিল্পীকে 'আর্ট ফর অ্যাকশন'-এর রোজেনবার্গ নির্ধারিত পথে গমনে বিড়ম্বনার কারণ হয়;—হয়তো...! এই জায়গায় আমি বিনয়ের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি। কারণ, রোজেনবার্গ সত্যিকার অর্থে কোনো 'পথ' দেননি। তিনি কোনো মধ্যপন্থা নির্ধারণ করেননি;—না জনতার, না অভিজাতের। তিনি শুধু একটি প্রশ্ন রেখে গেছেন : শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পী কি সত্যিই ঝুঁকি নিচ্ছেন, নাকি শুধু পুনরাবৃত্তি করছেন? প্রশ্নটি কেবল ক্যানভাসের ক্ষেত্রে নয়, বরং চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—অভিজাত বর্গীকরণ ও নিম্নবর্গের অনুপস্থিতি। সমালোচনাটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রবি বর্মার জগৎ মূলত পুরাণ, রাজদরবার, উচ্চবর্ণীয় নারী, নন্দনশীলতা এইসব দিয়ে তৈরি। এখানে সামাজিক বাস্তবতার বড় অংশ অনুপস্থিত। রোজেনবার্গের সংজ্ঞা

বিবেচনায় নিলে আমরা বলতে বাধ্য, রাজা রবি বর্মা এখানে existential risk নেননি, বরং প্রতিষ্ঠিত রুচির ভেতরে বসে কেবল কাজ করে গেছেন।

কিন্তু এই জায়গাও স্থির নয়। কারণ, তাঁর কাজের ভেতরে ঝুঁকি ছিল। ভারতীয় পুরাণকে নতুনভাবে দৃশ্যমান করে তুলছিলেন তিনি; যা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বহন করছিল তখন। আপনার লেখায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। শিল্পকে বাজারে নিয়ে আসছিলেন রবি বর্মা। ওই সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কাজটি সহজ ছিল না। অর্থাৎ, তাঁর ঝুঁকি ছিল নান্দনিকের চেয়ে অনেকবেশি সাংস্কৃতিক।

এই জায়গা থেকে বলা যায়—রাজা রবি বর্মা পুরোপুরি রোজেনবার্গের 'অ্যাকশন' ধারণার ভেতরে পড়ছেন না, আবার একেবারে বাইরেও তাঁকে রাখা যাবে না। তিনি যেন এক মধ্যবর্তী অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে উপস্থাপন ও সৃষ্টির ক্রিয়া, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সবকিছু একত্রে মিশে আছে।

আমরা দেখি, রোজেনবার্গ ফোক আর্টের গুরুত্বকে অস্বীকার করছেন না। বরং উল্টো :—তিনি সতর্ক করছেন, যদি আমরা কেবল ইউরোপীয় মানদণ্ডে বিচার করি, তাহলে অনেক শিল্প হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিজেই একধরনের স্পেস তৈরি করছে, যেখানে উচ্চশিল্প, লোকশিল্প, এমনকি বাণিজ্যিক শিল্পও আলোচনার ভেতরে আসে।

এই জায়গা থেকে রবি বর্মাকে দেখলে, তাঁকে সরাসরি বাতিল করা যায় না। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি একটি সাংস্কৃতিক 'অ্যাকশন' ঘটিয়েছেন, যদিও তা রোজেনবার্গের ক্যানভাস-কেন্দ্রিক 'অ্যাকশন' নয়।

রবি বর্মা যখন লিথোগ্রাফিক প্রেস কিনে তাঁর ছবি, বিশেষ করে পৌরাণিক চরিত্রগুলোকে সাধারণ মানুষের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেন, তখন তিনি আসলে high art-কে একধরনের popular image-এ রূপান্তর করতে থাকেন। অর্থাৎ, রাজপ্রাসাদ বা অভিজাত সংগ্রহের ভেতরে সীমাবদ্ধ শিল্পকে বাজার, ঘর, মন্দিরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

রোজেনবার্গ এই ঘটনাকে সম্ভবত দুভাবে দেখতেন। একদিকে, তাঁর ফোক আর্টের প্রতি যে-ঝোঁক, তা থেকে বলা যায়—তিনি এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিতেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, শিল্পকে শুধু ইউরোপীয় মানদণ্ডে বা গ্যালারির ভেতরে সীমাবদ্ধ করে দেখলে বাস্তব শিল্পজীবন অদৃশ্য হয়ে যায়। রবি বর্মার এই কাজ সেই সীমা ভেঙে দিয়েছে। শিল্প এখানে আর অভিজাতের বিষয় নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ সেখানে। এই অর্থে, রোজেনবার্গ এটাকে একধরনের সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে দেখতেন, যেখানে ছবি মানুষের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, তিনি হয়তো এটিকে কিছুটা সতর্ক দৃষ্টিতেও বিবেচনায় নিতেন। তাঁর কাছে আধুনিক শিল্পের মূল বিষয় ছিল শিল্পীর অভিজ্ঞতা, ভেতরের সংকট ও আত্মসচেতনতা। রবি বর্মার লিথোগ্রাফগুলো জনপ্রিয় হলেও, এগুলো আসলে একই ছবি বারবার ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। যার ফলে শিল্প একধরনের স্থির ছবিতে পরিণত হয়, যেখানে নতুন কিছু সৃষ্টি বা নতুন অভিজ্ঞতার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

রোজেনবার্গ সম্ভবত এই ঘটনাকে একমুখীভাবে বিচার করতেন না। তিনি হয়তো বলতেন :—এটা একইসঙ্গে মুক্তি ও সীমাবদ্ধতা। মুক্তি;—কারণ, শিল্প সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করায়

সামাজিক হয়ে উঠছে। সীমাবদ্ধতা;—কারণ, সেই শিল্প একইসঙ্গে একটি স্থির, পুনরাবৃত্ত ইমেজে পরিণত হচ্ছে, যেখানে সৃজনের ঝুঁকি কম।

সবচেয়ে গভীরভাবে দেখলে, রোজেনবার্গ হয়তো এই প্রশ্নটাই তুলতেন : ‘এই লিথোগ্রাফগুলো কি কেবল ছবি ছড়িয়ে দিচ্ছে, নাকি মানুষের অভিজ্ঞতাকে বদলে দিচ্ছে?’ যদি এগুলো মানুষের দেখার অভ্যাস, কল্পনা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় নতুন কিছু সৃষ্টি করে, তাহলে তিনি এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মানতেন। আর যদি এগুলো শুধু জনপ্রিয়তা আর বাজারের চাহিদা পূরণ করে, তাহলে তিনি এটাকে শিল্পের একধরনের স্থবিরতা হিসেবে হয়তো সমালোচনার তির হানতেন।

এই দ্বৈততা, এই টানাপোড়েন... রোজেনবার্গের চিন্তার ভেতরেই আছে।

. . .